দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUN. 2 0 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

পরিসংখ্যান ও প্রাথমিক শিক্ষার হাল

যে সব পন্ডিতমনা ব্যক্তি বাংলাদেশে কোন খাতেই উন্নত হয়নি মনে করেন তাদের সাথে একমত হওয়া কঠিন। শিক্ষা ও গণস্বাস্থ্যসহ বেশকিছু খাতে বাংলাদেশ যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে তা ইউএনডিপি রিপোর্ট থেকে জানা যায়। সাম্প্রতিক এক অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, গত ৯ বছরে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ৫০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে এবং শিক্ষকতায় মহিলাদের আগমন বেড়েছে। প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯৯০ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২০ লাখ ৫০ হাজার। ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬৬ লাখ ৬০ হাজার এবং ছাত্রী সংখ্যা ৫৩ লাখ ৯০ হাজার। ছাত্রছাত্রীদের অনুপাত ৫৫ঃ৪৫। ৯ বছর পর প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮৩ লাখ ৬০ হাজার। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৯৫ লাখ ৮০ হাজার এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৮৭ লাখ ৮০ হাজার। ছাত্রছাত্রীর অনুপাত ৫২ঃ৪৮।

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রভর্তির ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতিরই প্রতিফলন। একই সময়ে মাধ্যমিক পর্যায় ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেড়েছে। বিশেষ করে মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি চালু করায় ছাত্রীসংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। বর্তমানে কোন কোন মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রদের ছাড়িয়ে গেছে। এরই পাশাপাশি শিক্ষকতা পেশায় উল্লেখযোগ্য হারে মহিলাদের আগমনও উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা বলে আমাদের ধারণা।

কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তির হার যে ৫০ শতাংশ বেড়েছে বলে পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি ফাঁকিও রয়েছে। এই ৯ বছরে দেশে জনসংখ্যাও বেড়েছে। ফলে বর্ধিত জনসংখ্যার কারণে ছাত্রছাত্রীর ভর্তির হারও স্বাভাবিকভাবে বাড়বে। ভর্তির হার বৃদ্ধির অংক থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অংকটি বাদ দিলেই বৃদ্ধির প্রকৃত তথ্য পাওয়া যাবে। এই ৯ বছরে বহু নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক পর্যায়ে যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদানের পদ্ধতি আছে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনানুষ্ঠানিক ও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। এসব উদ্যোগ আয়োজনের ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা যে বেড়ে গেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রশ্ন হলো, এই ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের কত ভাগ টিকে থাকে আর কত ভাগ ঝরে যায়। আগের হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় তার অর্ধেকও পঞ্চম শ্রেণীর কোঠা পার হতে পারে না। অর্থাৎ মাঝপথেই তারা ঝরে যায়। এই ঝরে যাওয়ার হার ও সংখ্যা যদি কমানো না যায় তাহলে ভর্তি বাড়লে কোন লাভ হবে না।

এরই পাশাপাশি যে বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাহলো প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান সমুন্নত রাখা। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা এবং বছরশেষে উপরের শ্রেণীতে তুলে দেয়াই শিক্ষকদের কাজ নয়। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীরা কতটা শিক্ষা পেয়েছে সে হিসেব নেয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিবেচনায় প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের বেতন একেবারে কম নয়। কিন্তু প্রায়শই এই শিক্ষকদের ক্লাসে গরহাজির থাকতে দেখা যায়। তারা নিয়মিত স্কুলে যান না, স্কুলে গেলেও ক্লাস নেন না। বাংলাদেশে সর্বক্ষেত্রে ননওয়ার্ক কালচার তৈরি হয়েছে তা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও মুক্ত নয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের কাজকর্ম তদারকি করার জন্য থানা পর্যায়ে একাধিক শিক্ষা অফিসার আছেন, তারা কদাচিৎ বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শনে যান। শিক্ষকদের বেতন-বিলে সই করাই মনে হচ্ছে তাদের একমাত্র কর্তব্য। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার বাড়লেও শিক্ষার কোন অগ্রগতি হবে না। অতএব, এক্ষেত্রে দুটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে, প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি হওয়া, শিক্ষার্থীদের ড্রপ আউট ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা, দ্বিতীয়ত শিক্ষার মান ধরে রাখা। অন্যথায় শিক্ষার অগ্রগতি, বিভিন্ন পরিসংখ্যানেই সীমিত থাকবে বাস্তবে তার কোন প্রতিফলন দেখা যাবে না।